সনাতনী

গায়েত্রী

দেবনাথ

প্রকাশকের কথা

বর্তমানে সমস্ত বিষয়ের ন্যায় নারীহীনতা সংবাদপত্রের ও চলচ্চিত্রের শিরোনাম হইয়া দাঁড়িয়াছে। যদিও তাহার পরিবর্তন ঘটানো কোনো একাকী মানুষের পক্ষে অসম্ভব। তবু শুনিলে ভালো লাগে যে শত ভিড়ের অন্তর হইতে কিংবদন্তী এগিয়া আসে তাহার প্রতিবাদে। কিঞ্চিৎ কয়েকদিন পূর্বে দিদির সঙ্গে আলাপন এই সাহিত্যরই তরীতে। সাহিত্যের যে-কোনোও ধারায় তাঁহার গভীরতা আছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। হয়তো অধিকের দৃষ্টিকোণে আলোচ্য প্রবন্ধখানি সীমাবদ্ধ হইবে, তবে গভীরভাবে বুঝবার প্রয়াস করিলে জানা যাইবে সমাজের এই চিরাচরিত ক্যানভাস কাহারই অজানা নহে।।

১৭ই কার্তিক ১৪২৪

অনির্বাণ সেনগুপ্ত

উপক্রমণিকা

আলোচ্য লেখনী কোনো সংস্থা, ব্যাক্তি, কোনো প্রকার মাধ্যমকে কিংবা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে অবনত করিবার প্রয়াসে উপস্থাপনা করা হয় নাই। লেখনীর অন্তর্নিহিত অর্থ কেবল গ্রন্থকারীর চিত্তান্তর অনুভূতি মাত্রা।।

১৮ই কার্ত্তিক ১৪২৪

সালোক প্রকাশনী

সনাতনী

সনাতন ধর্ম, বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান পর্যন্ত নারী সৃষ্টির আঁধার মাতৃশক্তিরূপে পূজনীয়। অথচ কন্যা-ভ্রুণ হত্যার যজ্ঞ নিস্কচন উল্লেখিত। মনুসংহিতাতেও আধুনিকের ন্যায় নারী শিক্ষার সমানাধিকার। বাস্তবে অধিক পরিবারে কন্যা শিশু শিক্ষা হইতে বঞ্চিত। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষার উপর অর্থ ব্যয় অপচয়মাত্র। যৌতূকের নিমিত্তে অর্থ সংগ্রহই শ্রেয়।

বর্তমানে নারী সর্বক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে; সাফল্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে! তাহাই কি? বারংবার প্রতির্ষ্ঠিত হওয়া কন্যাভ্রূণ হত্যা, গৃহবধূদের অগ্নিদগ্ধ এবং নারী হইবার নিদারুণ বর্বরতার শিকারের বিম্বিত ক্রন্দনচিত্র বিনোদন হইতেছে দূরদর্শন-সংবাদপত্রে।

কোনো রাষ্ট্রের প্রকৃত বিকাশ, রাষ্ট্রীয় নারীর অবস্থানের দ্বারা নির্ধারিত। শিল্প-সংস্কৃতি-চলচ্চিত্র এই তথ্য বহন করিয়া লয়। বর্তমান বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র সমাহারের অধিকাংশই নারীকে পুরুষের মনতৃপ্তির বস্তু হিসাবেই তুলিয়া ধরে। পর্দায় নারীসত্ত্বার ব্যাখ্যা হয় কেবলমাত্র শারীরিক সৌন্দর্যের দ্বারা। চলচ্চিত্রের প্রভাবে সমাজও প্রভাবিত হইয়া থাকে।

আধুনিক নারী পশ্চিমা সভ্যতাকে অনুসরণ করিয়া থাকে, স্বাধীনতা প্রমাণ করিতে।

পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতি কী আদৌ নারীকে শ্রদ্ধাসন প্রদান করে?

খ্রিস্টীয় মতানুসারে নারী অশুভশক্তির প্রতীক। কাহিনীমতে, সর্বশক্তিমান ‘গড’ সর্বপ্রথম ‘এডাম’ এর সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে ‘এডাম’ হইতেই ‘ইভ’ এর সৃষ্টি হইয়াছে।

‘ইভিল’ শব্দখান ‘ইভ’ হইতেই আসিয়াছে, যাহার অর্থ অশুভ শক্তি। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে পশ্চিমা সভ্যতায় অর্থাৎ আমাদিগের আধুনিক মানসিকতামানবের নিকট নারীশক্তি হইলো অশুভ শক্তির প্রতীক।

গড ইভকে এডামের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিবার জন্য অভিশপ্ত করিয়াছিলেন। কি সেই অভিশাপ? ইভকে মাতৃত্বের যাতনা ভুগিতে হইবে। অর্থাৎ পশ্চিমা সভ্যতা সংস্কৃতিতে মাতৃত্ব অভিশাপ?

সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ অনুভূতি যে সংস্কৃতির নিকট অভিশাপ, তাহারা সত্যিই কি নারীকে মর্যাদার আসন প্রদান করিতে পারে?

বৈদিক যুগে স্বয়ম্বর সভা প্রমাণ করে নারীর জীবনসখী নির্বাচনের স্বাধীনতাকে। কিন্তু তাহা রাজপরিবারের অন্তরে সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমানে অধিক পরিবারে এই স্বাধীনতা রইলেও বর্তমান গ্রামাঞ্চলে অসম্ভব। এখনও কন্যাশিশুর বলপূর্বক স্বইচ্ছাবিমুখ বিবাহ হইয়া থাকে।

অশিক্ষার অন্ধকারে সেই নারীদের জীবন কেবলমাত্র সন্তান উৎপাদনের কারিগর হিসাবেই সীমাবদ্ধ।

নারী সুরক্ষার বহুবিধ আইন হইয়াছে। তথাপি নারীরা নির্দ্বিধায় ইচ্ছানুসারে সর্বত্র সুরক্ষিতভাবে চলাফেরা করিতে পারে না। কোনোরূপ দুর্ঘটনা কিংবা অসম্মান হইলে নারীর চলাফেরাকেই তাহার কারণ হিসাবেই আরোপিত করা হইয়া থাকে।

বৈদিকযুগে নারীদের দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার ছিল। কিন্তু কতটা সফল তা সন্দেহজনক। কয়েক বৎসর পূর্বেও সতীদাহ প্রথা ছিল। নারীর দ্বিতীয় বিবাহ চরম অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত।

আমরা শহরাঞ্চলের বা কিছু কিছু পরিবারের সফলতার দ্বারা বর্তমান সমাজে নারীর স্থান বিচার করিতে পারি না। প্রতিটি পরিবারে আভিজাত্যের আড়ালে নারীর অশ্রু লুকায়িত। আধুনিক নারীর চমকপ্রদ জীবনের আড়ালেও লুকাইয়া থাকে যাতনা। আপন লড়াই স্বয়ং লড়িতে হয়। আর প্রকৃত শিক্ষাই এই লড়াইয়ের হাতিয়ার।

নারীকেই বিবাহের পর সমস্ত মাঙ্গলিক প্রতীক ব্যবহার করিতে হয়। বহু যুক্তি বহু তর্ক। পুরুষ এইসব আচার নিয়মের ঊর্ধ্বে। সনাতন ধর্মে বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহের পর সিঁদুর পড়িতে হয়।

সিঁদুর লোহিতবর্ণের যা জীবনশক্তির প্রতীক। স্বামীর দিমায়ুর নিমিত্তে এই সিঁদুর ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে পুরুষাধীন নারীর ললাট কাটিয়া দিত ইহা প্রমাণ করিতে যে সেই নারী কাহারও অধীন। সিঁদুরের মাধ্যমেও বোঝানো হইয়া থাকে নারী তুমি তোমার স্বামীর অধীন, অর্থাৎ তুমি তোমার প্রভুর অধীন। সমস্ত অলংকারও ইহাই ব্যক্ত করে।

কিন্তু সনাতন ধর্মে সিঁদুর ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক মাহাত্ম আছে। বিবাহের পর নারীকে স্বামীগৃহে মানিয়া লইতে হয়। অধিকাংশ নারীই মানসিক যাতনা ও শারীরিক দুর্বলতার স্বীকার হয় বিবাহের পর। সিঁদুরের ব্যবহার কপাল হইতে মস্তিষ্কের মধ্যে বরাবর অবস্থিত। যাহাকে পরব্রক্ষ বলিয়া থাকে। সিঁদুরের মধ্যে অবস্থিত তরল ধাতু পারা নারীর পরব্রক্ষাকে শান্ত এবং সুস্থ রাখে। তাই বিবাহের পর নারী সিঁদুর ব্যবহার করেন। অর্থাৎ স্বামীগৃহে যে নারীর মানসিক যাতনা ভোগ করিতে হয়তো তাহাই প্রমাণিত।

বৈদিক যুগে নারীর পবিত্রতা তাহার শারীরিক সুচিতার উপর নির্ভরশীল ছিলোনা। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী হইতে বর্তমান যুগেও নারীর পবিত্রতা তাহার শারীরিক সূচিতর অন্তরে সীমাবদ্ধ। সীতাকেই অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে শ্রীরামচন্দ্রকে নহে। অর্থাৎ বৈদিক সাহিত্যও একাধারে দ্বৈতমুখবিশিষ্ট।

প্রশ্ন হইলো নারী পুরুষ উভয়েই রক্ত, মাংস, বুদ্ধি, বিবেক দ্বারা গঠিত। পবিত্র অথবা অপবিত্র শব্দটি শুধুমাত্র নারীর ক্ষেত্রেই কেন? পুরুষের ক্ষেত্রে কেন নয়?

এই দ্বন্দ্ব নারী-পুরুষের নহে, মানসিকতার ও দৃষ্টিভঙ্গির। আলোক-আঁধারের।

"বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টি চির কল্যাণকর
অর্ধেক তার গড়িয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর
নারী দিল সুধা, নর দিল ক্ষুধা
সুধায় ক্ষুধায় মিলে জন্ম লভিছে
মহামানবের মহাশিশু তিলে তিলে
কোন কালে একা জয়ী হয়নি কো
পুরুষের তরবারি
প্রেরণা দিয়েছে, শক্তি দিয়েছে
বিজয়ী লক্ষ্মী নারী"

কাজী নজরুল ইসলাম

প্রত্যেক কন্যাসন্তানের জন্মগত অধিকার হইলো শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানস্বরূপ। একমাত্র শিক্ষার আলোই সমস্ত অন্ধকার দূর করিতে পারে। নারীকে সমমর্যাদা কিংবা সর্বমর্যাদা প্রদানের প্রয়োজন নাই। নারীকে শুধুমাত্র নারী না ভাবিয়া 'মানুষ' ভাবিলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হইবে।।